লাতিন আমেরিকাঃ আশ্চর্য বাস্তবের দেশ

মহুয়া ভট্টাচার্য

"একজন নেগ্রো, বুড়ো, তার কড়া-পড়া বুড়ো আঙুলের হাড়ের কাছে মাস বেরিয়ে এসেছে, অথচ তবু সেই পায়ের ওপর অটল খাড়া... সেই যেদিন সান্‌তিয়োগো দে কুবার এক খামার মালিক তাকে মঁসিয় লেনরঁস দ্য মেজির কাছ থেকে তাশের জুয়োয় জিতে নিয়েছিল... কুবার মালিকের কাছে, (তার) বেঁচে-থাকাটা উত্তরের সমভূমির ফরাশিদের চেয়ে তুলনায় সহজতর ছিলো, সহ্য করা যেতো। ..... যদিও তাকে দু-দু বার লোহাদাগা হয়েছিলো... সে এখন এমন-এক দেশের মাটিতে পা দিয়েছে, যেখানে চিরকালের মতো ক্রীতদাস প্রথা বাতিল হয়ে গেছে"। [আলেহ কার্পেন্তিয়ের, "এই মর্তের রাজত্ব," অনুবাদ-মানবন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আলেহ কার্পেন্তিয়ে-এর রাচনাসংগ্রহ' দে'জ, ১৯৯১, পৃ-৬১]

হ্যাঁ, এই সেই কিউবা, লাতিন আমেরিকার ছোট্ট এক প্রদেশ, যাকে ক্রিস্তোবল কোলোন (ক্রিস্টফার কলম্বাস) দেখতে পেয়েছিলেন ২৮ অক্টোবর ১৪৯২ সালে। রানী ইসাবেলার নামে তিনি দ্বীপটা দখল করেন ও একটি বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেন। এই দ্বীপের বাসিন্দা তাইনোস, সিবোনেইরেস্, গুয়ানাতাবেইয়েসদের তিনি নাম দেন 'ইণ্ডিয়ান', কেননা ক্রিস্তোবাল কোলোন 'ভেবে ছিলেন' তিনি ইণ্ডিয়ার বোম্বাইতে এসে পৌঁছেছেন। প্রাকৃতিক সম্পদ ও শস্যের প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ কিউবা আমেরিকা পৌঁছনোর করিডোর-ও বটে। 'নাস্তিক', অ-খৃষ্টান, মূর্তি-পূজারী ইণ্ডিয়ানদের শুমারির নামে চলল হত্যা-পদ্ধতিতে গুনতি। লাশ গুনে বোঝা গেল কিউবায় দশ লক্ষেরও বেশি 'ইণ্ডিয়ান' 'ছিল'। বাকিদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে গিয়ে প্রথম বাধা পেল উপনিবেশকারী স্পেন। যদিও তাতে দমে না গিয়ে আবার গণ-নরহত্যার পর টান পড়ল মাঠে-ঘাটে-বন্দরে-খামারে কাজ করবার জন্য কাজের লোকের। উপায় –আফ্রিকা থেকে কালা আদমি সস্তায় ধরে আনা। সুলভ ক্রীতদাস ও সম্পদে ঐশ্চর্য্যশালী কিউবা সহজেই পড়ল ধুরন্ধর বানিয়া ইংরেজের চোখে। এক বছরের জন্য ইংরেজ ছিনিয়ে নিল কিউবাকে, কিন্তু ১৭৬৩ সালেই আবার ফিরিয়ে দিল এস্পানিয়ার হাতে। এদিকে কিউবার সম্পদ, টাকা, চিনি, তামাক, ফলমূল সব চলে যাচ্ছে এস্পানিয়ায়, কিউবার বাসিন্দা স্পেনদেশীদের টনক নড়ল। ১৮১৯ –এ তারা এস্পানিয়ার স্পেনদেশীদের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করল, যদিও প্রায় সবারই ফাঁসি হয় তাতে, তবুও বিদ্রোহের আগুন ঢিমে হয়নি। ততদিনে কিউবা ছাড়া সারা লাতিন আমেরিকা এস্পানিয়াদের থেকে মুক্ত হয়েছে। ফলে শুরু হল পরপর অভ্যুত্থান- ১৮২৬, ১৮২৮, ১৮৩০, ১৮৪৮, ১৮৫১, ১৮৫৫ কিউবার ইতিহাসের কঠিন সংগ্রামের সাক্ষী। দমন নীতির অব্যর্থ দাওয়াই হিসেবে ক্যাথলিক খৃষ্টানরা পাশ করল কিছু আইন - কিউবানরা সরকারি পদে থাকতে পারবে না, কোনো কারখানা বা ব্যবসা গড়তে পারবে না, কালা আদমি ও শেতাঙ্গদের মধ্যে বিয়ে চলবে না, কোন কিউবানের স্পেনদেশীর বিরুদ্ধে মামলা করার বৈধ অধিকার থাকবে না, কোনো কিউবান কাউকে বাড়ি ভাড়া দিতে পারবে না, এক জায়গা থেকে অন্যত্র যেতে পারবে না।

কিউবানরা এই আইন মুখ বুজে সহ্য করেনি। ১৮৬৮ সালে মস্ত জমিদার মাসেয়ো কার্লোস মানুয়েল দে সেস্‌পেদেস ক্রীতদাসদের মুক্ত করে দিয়ে এস্পানিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন এবং কিউবা প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন, পাশে পেলেন দাস প্রথায় জর্জরিত নেগ্রো, মুলাটো, মেস্তিসোদের। যদিও ১৫১৭ থেকে ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ অবধি আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাসদের ক্রমাগত আনা হয়েছে কিউবায়। দেশচ্যুত, ছিন্নমূল, এই দাসরা স্মৃতির ভারসায় সঙ্গে করে আনতে পেরেছিল শুধু তাদের সংস্কৃতিটুকু - পুরান, কিংবদন্তী, নাচগান, জীবনযাপন, সংস্কার ও বিশ্বাস। উৎপাটিত সংস্কৃতি কিউবার মাটিতে শেকড় গাড়তে গিয়ে সহজ ও স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলে কিছুটা পরিমার্জত সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর কিছুটা রয়ে যায় অপরিবর্তিত, স্মৃতি নির্ভর। আফ্রিকার ভাষা-সংস্কৃতি--সংস্কারের লাতিন আমেরিকার জল-হাওয়ায়--মাটিতে মানিয়ে নেওয়ার ছাপ স্পষ্ট পড়েছে সে দেশের জীবনে ও সাহিত্যে। প্রায় আরও একশো বছর পরে "১৯৫৯ –এর পয়লা জানুয়ারী তরুণ বিপ্লবী ব্যবহারজীবী ফিদেল কাস্ত্রো আরহেন্‌তিনার চিকিৎসক চে গ্যেভেরার সহায়তায় ফুলহেন্‌সিও বাতিস্তার স্বৈরাচারী সরকারকে হটিয়ে দিয়ে কুবাকে আমেরিকা মহাদেশের মুক্তাঞ্চলে পরিণত করেন। তৎকালীন সোভিয়েৎ ধাঁচের এক সমাজতান্ত্রিক সরকার কুবার রূপান্তর ঘটিয়ে দেয় কয়েক বছরের মধ্যেই"- [মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাদ্যায়, "বাস্তবের কুহক, কুহকী বাস্তবতা এবং আলেহো কার্পেন্তিয়ের" ঐ পৃ – ৩৩৮]

তিনশো বছরের স্পেনীয় ঔপনিবেশকতার ফল হিসেবে লাতিন আমেরিকার বেশির ভাগ দেশের ভাবনা এস্পানিওল হলেও তা এস্পানিয়ার ভাষা নয়।দেশের নিজস্ব ইতিহাস, উপনিবেশকারী ও উপনিবেশিতর দৃষ্টিভঙ্গি, রোমান ক্যাথলিক ধর্মের পাশাপাশি আমেরিকার নিজস্ব আসতেক, মায়া ও ইয়াঙ্কা সভ্যতার যৌথ ও কৌম ও স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা, লেখকদের

ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গি, নিজ নিজ প্রদেশের স্বতন্ত্র সমস্যা, ভাষার উচ্চারণ, শব্দভাণ্ডার প্রয়োগে এনেছে বৈচিত্র্য। পাশাপাশি আছে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজী ভাষায় ব্যবহার। রাজনৈতিক, ভৌগলিক, সামাজিক সমন্বয় ও বৈষম্য তাদের সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ ঘটিয়েছে। ফুটে উঠেছে সামাজিক অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন চেহারা। এই ধারা চলছে বিগত বিশ ও একুশ শতক জুড়ে।

এই বিক্ষুব্ধ ঔপনিবেশিকতার ইতিহাসে প্রথম প্রজন্মের লেখকদের মধ্যে একজন হলেন রোসুলো গায়াগোস, যাঁর জন্ম ১৮৮৪ সালে ভেনিজুয়েলার কারাকাসে। সাধারণ ঘরের ছেলে গায়েগোসের প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯২০-তে। এরপর ১৯২৯-এ 'কোনা বারবারা' উপন্যাসের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। দেশের বর্বরতাকে শিক্ষা ও সাহিত্য দিয়ে জয় করা যাবে- তাঁর এই বিশ্বাস এই উপন্যাসে স্পষ্ট হয়েছে। ১৯৪১-এ তিনি ভেনিজুয়েলার প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনে প্রেসিডন্ট নির্বাচিত হন। এর ঠিক ন মাস পরেই তিনি সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হন এবং পরবর্তী দশ বছর একনায়কতন্ত্রের সময় কিউবা ও মেক্সিকোতে বসবাস করেন। তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ কিউবার বিপ্লবের ওপর লেখা- অগ্রজ লেখক রোসুলো গায়াগোসের নামে সাহিত্য-পুরস্কার পায় সে-দেশে। বাংলাদেশ থেকে মেহেবুব আহমেদের অনুবাদে তাঁর 'শিখরে শান্তি' একটি অনবদ্য ছোটগল্প যাতে হতদরিদ্র দেশবাসীর চূড়ান্ত হতাশা, জিঘাংসা, আকাঙ্খা ও অসহায়তা ফুটে উঠেছে।

সে-দেশের প্রকৃতি শান্ত নয়। নিরক্ষরেখা, কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তির সহাবস্থানে গ্রীষ্মমন্ডলীয় অরণ্য হোক বা আন্দিজ পর্বতমালা বা বিশাল সমভূমি- মানুষকে বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে চলতে হয়েছে। এখানে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয় না, মূল্যবোধ ব্যর্থ হয়, হয় স্বপ্নভঙ্গ। এমনই এক বুনো পাহাড়ি অঞ্চলে লতাপাতা-ঝোপঝাড়ে ঘেরা খাড়া পাহাড়ের ধারঘেঁষে এক বিধ্বস্ত ঝুপড়ি ঘরে থাকে মা প্লাসিদা ও দুঃখী-দুস্থ ছেলে ফিলিপে। পাতায় ছাওয়া ঘরের ছাদে বহুকাল চিমনির ধোঁয়া ওঠেনি। ছেলেটা দরজায় বসে থাকে। "তার হাড় জিরেজিরে শরীরের ওপর মস্ত এক মাথা, পাতলা, নোংরা কিছু চুল খাড়া হয়ে রয়েছে মাথায়। তার পেট ফোলা, দুটো কঙ্কালসার হাত, পা-ভর্তি ঘা। ম্যালেরিয়ায় হাঁটু ফুলে গেছে, বিকৃত হয়ে গেছে পায়ের পাতা, হাড়ের ওপর চামড়া-ঢাকা অদ্ভুত চেহারা, খোসা ওঠা ঠোঁটের ভেতর দিয়ে দাঁত বেরিয়ে থাকে। তার কোটরে বসা চোখের সাদা অংশটা ভয়ানক রকম হলুদ আর তারায় প্রচণ্ড বোবা ব্যথার ছায়া"। [লাতিন আমেরিকার ছোটগল্প, অনুবাদ-হেমবুব আহমেদ,

যে কোন প্রান্তে এই অপুষ্ট, জীর্ণদেহ আমাদের যথেষ্ট চেনা, বহু অভিজ্ঞতার নির্মম সাক্ষী। অনড়, অক্ষম অসহায় এই ছোট্ট হৃদয়টা চারপাশের নড়াচড়া করা জীবন্ত সবকিছুর ওপর ঘৃণায় ক্ষতবিক্ষত, দলা পাকানো কান্না আর ভয়ানক রাগ তার বুকের মধ্যে গুমরে মরে; তিক্ত, জেদী এক দুঃখ অবিরাম তাকে কুরে কুরে খায়। দাঁতে দাঁত ঘষে বিশ্রী কিড়মিড় শব্দ করে। প্রচণ্ড আস্ফালনে নিজের হাত-পাগুলোই ছিঁড়ে-ছুঁড়ে শান্ত হয়ে পড়ে- এতেই তার অভুক্ত শরীরের সব শক্তি শেষ। অসুখে অসুখে জরাজীর্ণ শরীরের বোধগুলোও হারিয়ে গেছে। শুধু পেটে জ্বলতে থাকে ক্ষিদের আগুন। জ্বরে কাঁপতে থাকে শরীর। আর মনে ভেসে ওঠে একটাই ছবি- কয়লা খনি শ্রমিকের বড়, কালো বাহুর বেষ্টনে তার মা'র শরীর। বাবা চলে যাওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই মায়ের এই চেহারাটাই তার চোখে গেঁথে গেছে – কেন এমন হলো তা সে বুঝতে পারেনা, বুঝতে চায়ও না। শুধু এক তীব্র বিতৃষ্ণা তাকে মায়ের কাছ থেকে দূর করে রাখে। দিন-রাতে একটাও কথা বলেনা ছেলেটা।

ওর মা-র তাতে কিছু যায় আসে না। ভালবেসে কখনো সে দূরত্ব ঘোচাবার চেষ্টা ও করেনি। বরং ছেলের অসুস্থ চামড়ায় মেরে পিটে, গালি দিয়ে ওর হৃদয়টাকে দুমড়ে- মুচড়ে দিয়েছে। প্রতিবাদে ও-ও মারলে মা পাগলের মতো মারতে মারতে ওর রাগ থামাত, কিন্তু এক ফোঁটা জল আসত না, ছেলের চোখে। ফাঁদে-পড়া জন্তুর মত গজরাতো, গড়া-গড়ি দিত, মড়ার মতো পড়ে থাকত ঘন্টার পর ঘন্টা। এক অদ্ভুত পৈশাচিকতায় প্লাসিদা আরো একটা ফন্দি করেছিল। ফিলিপকে না মেরে তার হাতদুটো পেছনে নিয়ে বেঁধে ফেলে রাখত। রাগে, যন্ত্রণায় ঝরঝরে হয়ে যেত শরীর। মাটিতে পড়ে পড়ে অচেতন হয়ে পড়লে 'মেয়েলোকটা' ওকে ছেড়ে দিত। নিষ্কৃতি পেয়ে, দানবী মাকেও তখন মনে হত মাতা পবিত্র ঈশ্বর মাতা।

ওর মা এর পর থেকে বেশির ভাগ সময়টাই বাইরে থাকতে শুরু করল। বন-বাদাড় থেকে জোগাড় করা লাকড়ি কুড়িয়ে বা ভুট্টার শিষ কুড়িয়ে শহরে বিক্রি করে কয়েকটা রুটি বা কখনো একটু নোনা মাছ নিয়ে ঘরে ফিরতে তার রাত হয়ে যেত। তখন প্রচণ্ড খিদে নিয়ে খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত ফিলিপে। মা-ছেলের অসম লড়াইতে ফিলিপেরই হার হতো। কত নিঃসঙ্গ দিন আর নিদ্রাহীন রাত ও কাটিয়ে দিত লোভীর মত খাবারের চিন্তায়।

মানুষ, এমন কী মায়ের সহচার্য পায়নি যে অসুস্থ অসহায় বালক তার সঙ্গী হয়েছিল এক কুকুর। যেন তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল শুঁকে শুঁকে। ফিলিপের মনে হল কুকুরটা যেন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে তারই পরিত্রাণের জন্য। কুকুরের সঙ্গেই প্রথম নীরবতা ভাঙলো ফিলিপে। মা-আসার পায়ের শব্দে সতর্ক ও সন্দিগ্ধ হলো কুকুরও। গজরাতে লাগল

প্লাসিদাকে দেখে। কুকুর দেখে প্লাসিদাও বিরক্ত। তবু ভয় পেয়েছে সে, ফিলিপের পায়ের ভেতর থেকে কুকুরটার ভয় দেখানো চোখের দিকে তাকিয়ে আর তাড়ানোর চেষ্টা করল না প্লাসিদা, খুব অস্বস্তি হচ্ছিল তার।

রাতের খাবার ছেলের নাগালের বাইরে রেখে নিজে একটা রুটি নিয়ে খেতে বসল প্লাসিদা। ফিলিপে খিদের জ্বালায় মায়ের দিকে এগোতে থাকলে পাশে ঝোপের দিকে এক টুকরো রুটি ছুঁড়ে থামিয়ে দিল তাকে। ফিলিপে তার টুকরো থেকে কুকুরকে ভাগ দিলেও কুকুরটা রুটির টুকরো শুঁকে সরে গেল পাশে, বোধহয় অনুচ্চারিত ভঙ্গিতে সেই টুকরোটি দান করল বুভুক্ষু ফিলিপেকে, যা তার মাও করে না। তবে তার আগে নিশ্চিত হল তাতে বিষক্রিয়া নেই।

ফিলিপের হাড় বের করা শুকনো মুখ রুটি চেবানোর সময় আরো বেশি ভয়ংকর লাগছিল দেখতে। "তাকিয়ে থাকতে থাকতে সাংঘাতিক বিদ্বেষে ভরে গেল প্লাসিদার মন। ছেঁড়া, নোংরা কাপড়ের মতো ঘৃণিত জীব মৃত্যুর মুঠোয় দুলছে অথচ মরছে না"। কেন এই বিদ্বেষ জন্মদাত্রীর? নিজের সন্তান বড় বালাই কেন তার কাছে? হবে না-ই বা কেন? শহরে কাজের খোঁজে গেলে ওর জন্যে চাকরি হয় না। ওরকম ঘৃণিত জীব কেউ রাখতে চায় না ঘরে। প্রেমিক ক্রিসান্তো প্রেমের কথা বলে বলে কান ভারী করে দিলেও সেওতো ওর জন্যই নিতে চায় না। ক্রিসান্তোই বুদ্ধি দিয়েছিল প্লাসিদাকে, খাড়া পাহাড় থেকে ছেলেকে ফেলে দেওয়ার জন্য "তোমাকে ধরতে পারবে না, নিজের পায়ে দাঁড়াতেই পারে না, তার তো পাহাড় থেকে পড়ে যাওয়ারই কথা"। (ঐ পৃ-১৭) এই শোচনীয় জীবনের জন্যে যে ঘৃণিত সন্তান দ্বায়ী তার কুৎসিৎ মুখের দিকে তাকিয়ে ক্রিসান্তোর ইঙ্গিতের কথাই ভাবে প্লাসিদা। প্লাসিদার মনে হলো কুচিন্তার দুর্নিবার ঘূর্নিস্রোত ওকে ঠেলে নিয়ে যাবে। অস্থির প্লাসিদা কাঁপতে কাঁপতে হাতের রুটিটা ইচ্ছে করেই শূন্যে ঝুলন্ত ঝোপের দিকে ছুঁড় দিল।

"উঠে দাঁড়াল ফিলেপে, রাগে ফুঁসে ওঠা তীক্ষ্মদৃষ্টিতে স্থির করে দিল মাকে। ভেতরটা তোলপাড় করে উঠল প্লাসিদার, যার উদ্দেশ্য বুঝেছে ফিলিপে – ও রুটির টুকরোটা ধরতে চাইলে ওর ভারে ভেঙে পড়বে ঝোপঝাড় আর খাদে থেতলে যাবে ও। এক মুহূর্ত এক অনন্তকাল"। (ঐ, পৃ- ১৮)

না, মায়ের ইচ্ছে বা অনিচ্ছাকৃত মুক্তির বাসনা পূর্ণ হয় না। কুকুরটা ফিলিপের আগে একটা গর্জন করে লাফিয়ে পড়ে ঝোপে আটকে থাকা রুটির ওপর, ... গিরিখাতে খরস্রোতা খরস্রোতা নদীর গর্জনে কুকুরের গোগানি ঢাকা পড়ে যায়। ঝুপড়ির ফুটো ছাদ দিয়ে

বৃষ্টির জল বইছে ঘরে। দুই প্রান্তে নিঃশব্দ শুয়ে আছে মা ও ছেলে, দুই যুযুধান শত্রু। নাকি এক অবিচ্ছেদ্য নাড়ীর টান। বিদ্যুতের আলোয় ছেলের চোখের চমক দেখে ঘুমোতে সাহস পায় না মা। আবার ছেলের লড়াকু হয়ে ওঠা, প্রতিবাদী অভিব্যক্তি প্লাসিদাকে আকর্ষণও করে। কিন্তু সে উত্তর দিতে পারে না ছেলের জেদী প্রশ্নের – "মা, কেন আমার মরণ চাস তুই?"

প্লাসিদারা কি সত্যিই জান এ প্রশ্নের উত্তর? দেশমাতা লাতিন আমেরিকার ভূমিপুত্র হতদরিদ্র বিশাল জনগোষ্ঠীর ওপর কয়েক শতাব্দীব্যাপী যে ঔপনিবেশিক অত্যাচার, অবিচার চলেছে, শ্রমিকশ্রেনীর ক্রীতদাসেত্বের প্রজন্মব্যপী যন্ত্রণা, হতাশা, বুভুক্ষাই কি আজও প্লাসিদাদের মনে পুঞ্জীভূত হয়ে নেই? রক্তের সম্পর্কের প্রতি এই ঘৃণা-বিদ্বেষ জন্মাবার কি অন্য কোনো কারণ নেই যা তাদের অস্তিত্বের সংকটেরই নামান্তর? স্বামীর মৃত্যুর পর আহার-বাসস্থানের সুব্যবস্থা হয়তো প্লাসিদা করতে পারত শহরে গিয়ে, কিন্তু যুবতী রমণীর মানসিক-দৈহিক ইপ্সার দোসর খুঁজতে গেলেই সমাজ তাতে বাদ সাধে। এমনকী যে অবোধ, অপারগ বালক সেও কোনো এক প্রাচীন সংস্কারবশে মাকে অন্য পুরুষের বহুবেষ্টনে দেখতে পারেনা। একদিকে মায়ের প্রতি ছেলের তীব্র ঘৃণা আর মায়ের বিতৃষ্ণ অসহায় দায়বদ্ধতা ছেলের প্রতি। অন্যদিকে প্রতিবন্ধক ছেলেকে সরিয়ে মায়ের একটু বাঁচতে চাওয়া, একটা ঘরের নিরাপত্তা ও স্বামীর সান্নিধ্য। আর অসুস্থ, পঙ্গু ছেলের মায়ের ওপর নিরুপায় নির্ভরশীলতা এই দ্বন্দ্বই গল্পের মূল রস। একে যদি রূপক ধরি তাহলে সহজেই বোঝা যায়, বিদেশি শাসকদের হাত থেকে মুক্ত হলেও লাতিন আমেরকার বিভিন্ন অঞ্চলে যখন স্বদেশীয় স্থানীয় নেতারা রাজা হয়ে বসল তখন তারাও ঔপনিবেশিক হ্যাঙওভার কাটাতে পারলনা। এতদিনের বঞ্চনার অত্যাচারের শোধ তুলতে লাগল নিজেদের দলের গরীব মানুষের ওপর। আবার তৈরি হল ক্ষমতার আধিপত্য, অবস্থানের বৈষম্য, ক্রীতদাসের দল। যেমন দেখা যায়, আলেহো কার্পেন্তিয়েরের 'পলাতক' গল্প এক সজীব বাস্তব। যেকোনো নিগ্রো ক্রীতদাস প্রভুর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় বনে-পাহাড়ে, সেখানে তাড়া করে আসে প্রভুর শিকারী কুকুর, অথচ ক্রমে তারই সঙ্গী হয়ে ওঠে কুকুরটা। স্বাধীনতার সন্ধানে একদিন ঐ কুকুরই মিশে যায় বুনো কুকুরদের দলে, আর তার আগে সঙ্গী ক্রীতদাসের টুঁটি ছিঁড়ে দিয়ে যায়। স্বাধীনতার সংগা ও মাত্রা ক্রমশই পাল্টে পাল্টে যায়। সে পথে কোনো প্রতিবন্ধকতাকেই স্বাধীনতা-প্রত্যাশী রেহাই দেয় না। সেখানে আত্মজ ফিলিপেরাও ছাড় পায় না। কালো রাজা আঁরি ক্রিস্তফের কাহিনী, হেইতির তুস্যাঁ লুভেরতুর তাই লাতিন আমেরিকার ইতিহাসেরই এক একটা অধ্যায় হয়ে উঠেছে যেন। বাস্তব আর আশ্চর্যের (real and marvel) এ এক অবিস্মরণীয় মিলন যার সফলতম সাহিত্যিক প্রকাশক Magic Realism যা লাতিন

আমেরকার সাহিত্যকে ইংলন্ডীয় Realism, ফরাসী Surrealism থেকে স্বতন্ত্র করে তুলে ছিল। গায়ে গোসের 'শিখরে শান্তি' গল্পেও মা-ছেলের সম্পর্কের যে বাস্তব দায়বদ্ধতা নিরুপায় নির্ভরশীতা ও অসাধারণ ঘৃণা তা আমাদের আশ্চর্য করে। এবং এ-ও মনে করায় দুটি চরিত্রই এক্ষেত্রেও স্বাধীনতার প্রত্যায়ী – পরিস্থিতি থেকে, অসহায়তা থেকে, দুঃস্থ বিপন্নতা থেকে এবং অবশ্যই অস্তিত্বের অপরিচয় থেকে। কেন্দ্রীয় শক্তি প্রান্তিককে চিরকালই পিষে মারতে চায়। কিন্তু এত বীভৎসতার পরেও মা-ছেলে একই ছাদের তলায় আশ্রিত। প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ দুজনেই দুজনের ওপর অনুভব করে। এই শাশ্বত সম্পর্কের মধ্যে যদি ভঙ্গুরতা আসুক ছেলের অমোঘ প্রশ্নের সামনে মা কিন্তু হার মানতে বাধ্য হয়।

১৯৪২ সালে জন্মগ্রহণ করা চিলির ইসাবেলা আয়েন্দের ইভালুনা গল্পসংগ্রহের 'বিচারকের পত্নী' গল্পেও মানবিক সম্পর্কগুলোর নানা মাত্রা দেখা যায়। তিন বছরের শিশু আয়েন্দে দেখেছিলেন নিজের বাবা-মায়ের বিবাহবিচ্ছেদ। দাদু-দিদিমার সংস্পর্শে প্রচুর বই ও জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চার পরিবেশে বড় হওয়া কিশোরী আয়েন্দে মা ও দ্বিতীয় বাবার সঙ্গে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে গিয়েছিলেন। ষোলো বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে নানা চাকরি করেছেন, অভিজ্ঞতা কুড়িয়েছেন। কুড়ি বছর বয়সে বিয়ে করেছেন। পূর্বতন কাকা চিলির মার্কসবাদী প্রেসিডেন্ট সালভেদর আয়েন্দের সান্নিধ্যে থেকেছেন, রক্তক্ষয়ী সামরিক অভ্যুত্থানে তাঁর মৃত্যু দেখেছেন। আয়েন্দের প্রথম উপন্যাস 'দ্য হাউস অব স্পিরিটস' লেখা হয় তাঁর দাদুর শততম জন্মদিনে স্বেচ্ছা মৃত্যুর বাতাবরণে ১৯৮১ সালে। লাতিন আমেরিকার নারীর লেখা এই প্রথম একটি গ্রন্থ আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছিলো। ১৯৮৫ সালে তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাস 'অব লাভ, অ্যান্ড শ্যাডোজ' প্রকাশিত হয়। এছাড়া তাঁর ইভালুনা উপন্যাস ও ইভা লুনা গল্প সংগ্রহ তাঁর কীর্তির পরিচায়ক।

দুঃখী হুয়ানার ছেলে ভিদালের জন্ম হয়েছিল শহরের একমাত্র পতিতালয়ের জানলাহীন ঘরে। পিতৃ পরিচয়হীন ভিদালের পৃথিবীতে জায়গা হবার কথা নয়। মা এ কথা বুঝত বলেই পেটে থাকতে অনেকভাবে নষ্ট করার চেষ্টা করেছে – "শিকড়বাকড়, মোমবাতির টুকরো, রেচক ওষুধপত্র এবং অন্যান্য পাশবিক সমস্ত উপায় ব্যবহার করেছে, কিন্তু শিশু জীবন আঁকড়ে ধরে রইল"। (ঐ. পৃ- ১৩৩) । বেশ কয়েকবছর পর একবার ছেলের দিকে তাকিয়ে হুয়ানার ভাবছিল ছেলেটা কেন এত অদ্ভুত আর অন্য রকম হয়েছে। ওর মনে হলো শিশুকে নির্মূল করার অব্যর্থ উপায়গুলো শুধু ব্যর্থ হয়েছে তাই না, বরং ছেলেটা দেহে মনে লোহার মত শক্ত হয়ে উঠেছে। জন্মের সময়ই তার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছিল- বেচারার

মাথাটা যাবে মেয়েমানুষর জন্য। বড় হয়ে বিকৃত অঙ্গের মতো এই শব্দ-কটা চেপে বসল ছেলেটার ওপর। নিজের নিয়তি মনে রেখে সন্তর্পণে সে দূরত্ব বজায় রাখত মেয়েদের সঙ্গে। মানসিক সম্পর্কে কখনো আবদ্ধ হয়নি, বরং পৌরুষের দাবী সন্তুষ্ট করার প্রয়োজনে মেয়েদের সংক্ষিপ্ত সাহচার্যেই মনটাকে সে বেঁধে রেখেছিল। কিশোর বয়সেই ছোরা খেলে সে ক্ষতবিক্ষত করেছিল তার মুখ, কুড়ি বছর বয়সে সে এক দুর্বৃত্ত দলের সর্দার হয়ে গেল। হিংস্র স্বভাবে ওর পেশী শক্ত হলো, পথ ওকে নিষ্ঠুর করে তুলল আর নারীর শিকার হবার ভয়ে যে নিঃসঙ্গতার দণ্ড সে ভোগ করছিল তাতে তার চেহারাটা বিষন্ন দেখাত।

যে কোনো অপরাধমূলক কাজ ঘটলেই পুলিশ নিকোলাস ভিদালকেই খুঁজত কিন্তু এই দুর্ধর্ষ দুশমনকে করায়ত্ত করতে পারেনি সৈন্যরাও। আইনের এইজাতীয় লঙ্ঘন দেখেদেখে ক্লান্ত বিচারক হিদালগো দ্বিধা-সংকোচ ঝেড়ে ফেলে ঠিক করলেন এই দস্যুর জন্য ফাঁদ পাততে হবে। ন্যায়ের জন্য অন্যায় করলেও তিনি বুঝলেন ভিদালকে ধরার আর অন্য উপায় নেই। তাই তিনি ভিদালের একমাত্র স্বজন তার প্রৌঢ়া নিরপরাধ মাকে পতিতালয় থেকে টানতে টানতে নিয়ে এসে বিশেষ মাপের খাঁচা তৈরি করে প্লাজা দ্য আরমাস এর মাঝখানে সেটা বসিয়ে মাত্র এক জগ জল দিয়ে হুয়ানাকে তার ভেতর ঢুকিয়ে বন্দী করে রাখলেন। উদ্দেশ্য- জল শেষ হয়ে গেলে চিৎকার করবে মা, তখন ছেলে আসবে এবং তাকে ধরা হবে।

জলের শেষবিন্দু নিঃশেষ হবার আগেই খবর পৌঁছল নিকোলাসের কাছে। এধরণের নির্যাতন দাসপ্রথার পর আর কখনো ঘটেনি। কিন্তু খবরটা শুনে ভিদালের অনুভূতিহীন নিঃসঙ্গ নেকড়ের মত চেহারায় আবেগের কণামাত্রও দেখা গেল না। বহু বছর অদেখা মায়ের প্রতি কোনো আবেগ তার নেই। শৈশবের মধুর স্মৃতিও নেই, কিন্তু এখানে তো শুধু আবেগ নয়, সম্মানের প্রশ্নই বড়। "দস্যুদের মনে হলো এরকম অপরাধ কোনো পুরুষ সহ্য করতে পারে না, তারা অস্ত্র আর ঘোড়া প্রস্তুত করল, ... কিন্তু তাদের নেতার কোনো তাড়া দেখা গেল না। তার যে সাহস নেই তা মোটেও নয়। দলের সবাই উত্তেজনায় ঘামতে লাগল, রিভলবারের বাটে হাত বোলাতে লাগল। কেউ কেউ ভাবল ভিদালকে যতখানি হৃদয়হীন ভাবা হয় ও তার চেয়েও বেশি, কেউ ভাবল সে হয়তো কোনো দৃষ্টান্ত মূলক উপায়ে মাকে উদ্ধারের পরিকল্পনা করছে। সব জল্পনা ব্যর্থ করে ভিদাল অনড় থাকল, জজসাহেবের ধৈর্য্য ও সাহসের জরিপ করতে লাগাল।

তৃতীয় দিন দুঃখী হুয়ানার চিৎকার থেমে গেল, আর জলও চাইল না সে। "ভ্রূণের মতো গুটিয়ে শুয়ে রইল খাঁচার মেঝেতে, ফোলা ফাটা ঠোঁটে, বোবা চোখে একটু জ্ঞান থাকলেই মৃদু একটা গোঙানির শব্দ করতে লাগল, বাকী সময়টা কেটে গেল নরকের স্বপ্নে। (ঐ. পৃ-১০৫)। চারজন অস্ত্রধারী পাহারাদারের দৃষ্টি এড়িয়ে কেউ তাকে জল দিতে পারল না। শহরে হুয়ানার দুঃখে সমব্যথী মানুষের ঢল বিচারক ঠেকাতে পারলেন না। শনিবার- শ্রমিকদের বেতনের দিন- রাস্তায় ভিড় জমায় বুভুক্ষু খনি শ্রমিকরা। একদল ক্যাথলিক মহিলাকে নিয়ে পুরোহিত বিচারকের কাছে হুয়নার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে গেলে দরজাতেই বাধা পেলেন। শহরের মাথা-জাতীয় কিছু লোক ঠিক করল বিচারকের পত্নী, দায়লু কাসিলদার কাছে যাবে। সুদীর্ঘ নির্যাতনের শব্দ বিচারকের বাড়ির বিশাল ঘরগুলোতেও পৌঁছেছিল। কাসিলদা বাচ্চাদের নিয়ে রবিবারে রওনা দিল প্লাজার দিকে সঙ্গে হুয়ানার জন্য খাবার ও জল। প্রহরীরা রাইফেল উঁচিয়ে পথ আটকালো। সাত বছর বিবাহিত জীবনে এই প্রথম কাসিলদা স্বামীর বিরোধিতা করল, খাঁচার দরজা খোলা হল, দেওয়া হল জল ও খাবার। ভিদাল হাসল অহংকারের হাসি, বিচারকের সাহস হার মেনেছে, কিন্তু পরদিন শোনা গেল হুয়ানা আত্মহত্যা করেছে পতিতালয়ের সেই ঘরে যেখানে একদিন সে ভিদালের জন্ম দিয়েছিল, লালন করেছিল। "একমাত্র ছেলে তাকে ত্যাগ করেছে, আর মাঠের খোলা ময়দানের মাঝখানে খাঁচার ভেতর পচতে হলো, কোনো বিহিত করল না ছেলে, এই লজ্জা সহ্য করতে পারল না"। (ঐ. পৃ-১৩৬) । এইবার নড়ে বসল ভিদাল। জজের সময় শেষ। প্রতিআক্রমণ করে জজের দেহ রাখবে খাঁচায়। পিছু নিল সে। বিচারক নির্মম অত্যাচার করেও ভিদালকে ধরতে পারলেন না, বরং জুটল শহরবাসীর প্রতিকূলতা, পরপর রাত জাগার ক্লান্তি, অহংকার চূর্ণ হওয়ার লজ্জা, আর তার ওপর প্রাণভয়ের উত্তেজনা। পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে পরিবার নিয়ে তিনি বিশ্রামের জন্য সমুদ্রতীরে রওনা দিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত মানসিক জ্বালায় পথেই হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা গেলেন, চালক বিহীন গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খানায় গিয়ে পড়ল। কাসিলদার থেকে দ্বিগুণ বয়সী, খুঁতখুঁতে একগুঁয়ে স্বামীকে সে সবদিক থেকে পূর্ণতা দিয়েছিল, বৈধব্য যে অকালে আসবে সেকথাও সে জানত, কিন্তু স্বামী যে তাকে শত্রুর মুখে ফেলে যাবে তা সে কখনো ভাবেনি।

অসীম আকাশের নীচে জনপ্রাণীহীন বিশাল সমভূমির বুকে, ঝলসানো রোদে তিনটি শিশু সন্তানকে নিয়ে অসহায় বোধ করল কাসিলদা। সেনাবাহিনী তাদের উদ্ধার করতে আসার আগে বাচ্চাদের সে লুকিয়ে রাখল পাহাড়ের মাঝে এক গুহায়। নিজে নেমে আসল নীচে,

গাড়ির কাছে গিয়ে মৃত স্বামীর চোখের পাতা বন্ধ করে দিয়ে, নিজের কাপড়, চুল ঠিকঠাক করে অপেক্ষা করত লাগল শত্রুপক্ষের।

ভিদালের দলে কজন লোক আছে জানত না কাসিলদা, ও চাইছিল, অনেকে থাকুক, "এক এক করে বহু সময় কাটিয়ে দেওয়া যাবে তাহলে ..... মনে হলো আরো যদি শক্ত, সমর্থ হতে পারত, আরো যদি বেশি থাকত ওর কামনা জাগাবার ক্ষমতা তাহলে সহ্য করতে পারত আরো বেশি, সহজেই জয় করে নিতে পারত সেনাবাহিনীর লোক এসে বাচ্চাদের সরিয়ে নেওয়া পর্যন্ত। - (ঐ. পৃ- ১৩৭) । বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলোনা তাকে। ধুলোর ঝড় উড়িয়ে ঘোড়ায় চেপে একজন মাত্রই এসেছে, হাতে বন্দুক, মুখে দাগ। কাসিলদা চিনল – এই ভিদাল। একা এসেছে কারণ লড়াইটা তার একা, বিচরকের সঙ্গে। কাসিলদাও বুঝেছিল প্রতিপক্ষ একা নারী হলে কী শাস্তি তার প্রাপ্য সেটাকেই সে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। সন্তানদের মুখ চেয়ে সে প্রস্তুত হয়েই ছিল মনে মনে শুধু একটু সময় তার প্রয়োজন ছিল, সেনাবাহিনী এসে পড়া পর্যন্ত তার সর্বস্ব উপভোগ করবে, ঠেকিয়ে রাখতে হবে দস্যুদলকে।

ভিদাল দূর থেকেই বুঝেছিল শত্রু মৃত্যুর ঘুমে শান্ত, কিন্তু তার স্ত্রী তো রয়েছে। এগিয়ে এল সে। কাসিলদা মুখ সরিয়ে নিল না, চোখ নামাল না। বিস্মিত ভিদাল দেখল এই প্রথম জীবনে একজন মানুষ নির্ভয়ে তার মুখোমুখি হয়েছে। কয়েক সেকেন্ড এরা একে অপরকে বুঝতে চাইল, শক্তির পরিমাপ করতে চাইল, প্রতিহত করার ক্ষমতা বুঝে নিতে চাইল। ওরা যে দুজনেই দুই দুর্দান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী তা স্পষ্ট হল তাদের কাছে। বন্দুক নামিয়ে রাখল ভিদাল, কাসিলদা হাসল। পরবর্তী কয়েক ঘন্টায় প্রতিটা মুহূর্ত জয় করে নিল কাসিলদা। সৃষ্টির আদি থেকে প্রলুব্ধ করার জন্য নারী যতরকম ছলকলা শিখেছে তাতে আরো নতুন কিছু যোগ করল সে, ওকে সাহায্য করল প্রয়োজন-বোধ --- মানুষটাকে আনন্দের শীর্ষে নিয়ে যেতে হবে তাকে। দক্ষ শিল্পীর মত ভিদালের শরীরের প্রতিটি তন্তুকে সে পুলকে মাতিয়ে তুলল। দুজনেই জানে প্রতিমুহূর্তে ওরা বিপদগ্রস্ত, এই বোধ ওদের মিলনে এক নতুন আর ভয়াবহ মাত্রা যোগ করল। ভিদাল পরিতৃপ্ত হলেই কাসিলদার ওপর নেমে আসবে তার বন্দুক। কাসিলদাকেও সেনাবাহিনী না আসা পর্যন্ত ধরে রাখতেই হবে ভিদালকে।

নারীসঙ্গ বঞ্চিত ভিদাল কৈশোরে, যৌবনে এতদিন পর্যন্ত সতর্কভাবে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিল মেয়েদের কাছ থেকে। এই ঘনিষ্ঠতা, আবেগ, অনুভূতির উন্মাদনা, যৌথ

প্রেমের আনন্দ ওর জানা ছিল না। প্রতি মুহূর্তে সামরিক বাহিনী তার মৃত্যুকাল নিয়ে এগিয়ে আসলেও কাসিলদার দেহসুখের বিনিময়ে তা-ও মেনে নিতে রাজী ছিল ভিদাল।

শান্ত, লাজুক, তরুনী কাসিলদা বিয়ে করেছিল এক শুদ্ধাচারী বৃদ্ধকে। ওর পরিপূর্ণ রূপে ওকে কখনো দেখেননি বিচারক স্বামী। এক অতৃপ্তি কাসিলদার মধ্যে থাকলেও সে স্বামীর প্রতি কর্তব্যে কখনো ভ্রষ্ট হয়নি। আর বিপদকালে যুবক ভিদালের সঙ্গে সঙ্গমেও সে এক মুহূর্তের জন্যও ভোলনি তার উদ্দেশ্য– তার সন্তানদের বাঁচানোর জন্যই তার সময় নেওয়া। -"কিন্তু তবু কোনো একটা জায়গায় এসে নিজের সম্ভাবনায় ও নিজেই বিস্মিত হয়েছিল এবং নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছিল। ভেতরে ভেতরে কৃতজ্ঞতার কাছাকাছি একটা বোধ জেগেছিল ভিদালের প্রতি"। (ঐ, পৃ- ১৩৮)। আর সেই জন্যই দূর থেকে সেনাবাহিনীর শব্দ পেয়ে ভিদালকে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যেতে অনুরোধ করেছিল বিচারকের পত্নী। কিন্তু নরী-শরীর–বুভুক্ষ, প্রেমরঞ্জিত ভিদাল চাইল ওকে পরমসুখে শেষ আলিঙ্গনে বেঁধে রাখতে। ফলতঃ নারীর জন্যই তার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হলো।

অদ্ভুত বৈপরীত্য দুটো গল্পে, যদিও মনের গতিবিধির সুক্ষ্ম চালাচলগুলো একই রকম। শুধু সম্পর্কগুলোর স্থান বদল হয়ে যায়। শিখরে শান্তিতে উভয়েরই উভয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা, আকর্ষণ ও নির্ভরশীলতা সম্পর্কটাকে এক জটিল স্তরে নিয়ে গেছে। 'বিচারকের পত্নী' গল্পেও দেখি মা-ছেলের সম্পর্ক তথাকথিত কোমল, আবেগপ্রবণ নয়। হয়তো তার কারণও সেই অস্তিত্বের সংকট, পরিচয়ের গ্লানি, সামাজিক অবস্থানের অসহয়তা। শৈশবে তাই মা-ও সন্তানকে সুখের, স্নেহের বন্ধনে বাঁধেনি। তাই নিরপরাধ মা শহরের রাস্তায় পশুর মতো খাঁচায় বন্দী হয়ে একটু জলের অভাবে মারা যেতে বসলেও ছেলের কাছে তা কোনো আবেদন সৃষ্টি করে না। তার অদম্য জেদ ও প্রতিপক্ষের সাহসের পরীক্ষা করাই তার কাছে গুরুত্ব পায়। তার মা যে খাবার ও জলের অভাবে নয়, ছেলের নিঃসাড়তার দুঃখে আত্মহত্যা করল তাও ছেলেকে ভাবায় না। হয়েতা সেই ভাবনা বোধ পর্যন্ত পৌঁছোয়ই না। কিন্তু প্রতিপক্ষ হার মেনেছে, তার সঙ্গে সাহসের টক্কর দিয়েছে, অতএব এবার প্রতিশোধ নিতে হবে। তাকে না পেলে, তার নিরপরাধ পরিজনের ওপরে হলেও প্রতিশোধ নিতে হবে। এরই পাশাপাশি মা কাসিলদা মহানুভব। সন্তানের রক্ষায় যে মা তার সম্ভ্রমটুকুকেও বিসর্জন দিতে পারে। যে কাসিলদার চুল, কাঁধও ঢাকা থাকত কালো কাপড়ে সেই আজ উন্মুক্ত প্রান্তরে, খোলা আকাশের নীচে, স্বামীর মৃতদেহের পাশে পরপুরুষকে কামনার অস্ত্রে পরাজিত করেছে। একমুহূর্তের জন্যও ভোলেনি, তার পরগামিতার কারণ সন্তানদের রক্ষা করা। এহেন

কাসিলদার মনেও কি মুহূর্তের জন্য জাগেনি যুবক পুরুষের প্রতি সহৃদয়তা? তার অতৃপ্ত বাসনার আকাঙ্খা? যৌথ উন্মাদনায় সঙ্গম-সুখ লাভের কৃতজ্ঞতার নাকি এ কৃতজ্ঞতা শত্রু ভিদালের প্রতি শুধুই তার ছলাকলার অস্ত্রে ধার দেবার জন্য? অপ্রত্যাশিত সময় ব্যয় করতে পারার সাফল্যে? সেনাবাহিনীর হাতে শত্রুকে তুলে দিতে পারার কৃতকার্যতায়।

ছোটগল্প এতকিছুর উত্তর দিয়ে গেলে আর ছোটগল্প থাকবে না। বিশেষ করে লাতিন আমেরিকার গল্পের ভাবভঙ্গি অবশ্যই স্বতন্ত্রতার দাবি রাখে। অন্যন্য মনস্তাত্বিক সংঘাত, দোলাচলের মত যৌন অঙ্গ, যৌনতাও লাতিন আমেরকার একটি সাহিত্যিক প্রকরণ। ক্ষমতা প্রদর্শনের, দুর্বলের ওপর অত্যাচারের মাধ্যম। যেভাবে এসেছিল মেহিকোর বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এদুয়ার্দো দেলরিয়োর কমিক্সের বই, আন্দ্রে বেঁতর পরাবাস্তববাদ। আলেহো কার্পেন্তিয়েরের কুহকী বাস্তববাদ, মিগেল আনহেল আস্তুরিয়াসের পুরাণকথা। তারই সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে মিশেছে ভুডু, জাতিবিদ্বেষ, শ্রেনিবিদ্বেষ, রতির উৎকাঙ্খা, মিথ্যার আভিজাত্য। লাতিন আমেরিকায় বারবার ঘটেছে অভ্যুত্থান। এক অপশাসনকে সরিয়ে এসেছে আর এক অপশাসন। সাধারণ মানুষের অবস্থানের বদল হয় না। শোষকশ্রেনীর প্রতি, কেন্দ্রীয় শক্তির প্রতি সংগ্রামের পথেই আসে স্বাধীনতা অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রামেরই অপর নাম স্বাধীনতার লড়াই। এ লড়াইটাতে সামিল সমাজের সবস্তরের মানুষ। নীচুস্তরের ওপর, দুর্বলের ওপর ধারাবহিকভাবে স্তরে স্তরে উচুতলা থেকে অত্যাচারটা হতে থাকে বলে সেটাই আমাদের চোখে পড়ে বেশি। এই মানুষ গুলোই তাই রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত হয়ে হারায় ন্যূনতম আশা-ভরসা-মুল্যবোধ। পশুতে-মানুষে তাই বারবার এক হয়ে যায় লাতিন আমেরিকার গল্পগুলিতে। এদের আমরা ছোট চোখে দেখি, কিন্তু বিচার করিনা এদের পরিবর্তনের করনা। পুরো সমাজ ব্যবস্থাটাকে উৎপাটন করতে পারিনা বা চাই না। এদেরই গল্প বারবার আসে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। "সুন্দর আর কদর্য, আত্মকেন্দ্রিকতা আর নৈর্ব্যক্তিকতা, ধর্মবোধের উৎসার আর যৌনতার প্রকোপ, তাৎক্ষণিক আর শাশ্বত- সব সারাক্ষণ পর-পর হানা দেয় লেখায়" আলেকজাণ্ডার, পোপ যাকে বলেছিলেন 'সব শিল্পেরই নাগালের বাইরে'। [মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐ, পৃ- ৩৬৭)।]